Impact Factor (QJIF): 8.38 E-ISSN: 2583-7206, P-ISSN: 3049-2432

International Journal of All Subject Research

Received: 16/January/2026 IJASR: 2026; 5(2):23-27 Accepted: 23/February/2026

বনফুলের নাটক: বিষয় বৈচিত্র্যের নানা দিক

[*1]সুভাষ উপাধ্যায়

[*1]প্রাক্তন ছাত্র, বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বিমূর্ত

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের একজন প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। কথাসাহিত্যের পাশাপাশি নাট্যসাহিত্যেও তাঁর প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট । তিনি কালা জাদুর মন্ত্র প্রয়োগ বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটকে কৌতুকরস প্রবণ মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনরসকে প্রস্ফুটিত করেছেন। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের জীবন ইতিহাসের উপর জীবনচরিতধর্মী নাটক রচনা করেছেন। এমনকি আরব্য উপন্যাসের প্রভাব তার নাটকগুলিকে অন্যমাত্রা দান করেছে। হাস্যরসধর্মী গীতিনাট্য রচনায় তিনি নিজের কৌতুকপ্রবণ মনের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। বনফুলের রচনায় সমাজমিতির নানাদিক সুচারুভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

মূল শব্দ: কালা জাদুর মন্ত্র প্রয়োগ, মধ্যবিত্ত পরিবারের মৌরসীপাট্টা, জীবনচরিতধর্মী নাট্যরস উপস্থাপন, আরব্য উপন্যাসের প্রভাব, হাস্যরসপ্রধান গীতিনাট্য, প্রণয়রসের উদগীরণ।

১. ভূমিকা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম: ১৯ জুলাই ১৮৯৯ - মৃত্যু: ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯) একজন বাঙালি কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। তিনি বনফুল ছদ্মনামেই অধিক পরিচিত। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের মণিহারীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার শিয়াখালা গ্রাম। তাঁদের পরিবার "কাঁটাবুনে মুখুজ্জ্যে" নামে পরিচিত ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কথাসাহিত্যিক বনফুলের পরিচয় নতুন বিষয় নয়, কিন্তু নাট্যকার বনফুল হিসেবে তাঁর পরিচয় সিংহভাগ পাঠকের কাছে অজানা। তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনার জীবনে অজস্র নাটক রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম— 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৯৩৮), 'রূপান্তর' (১৯৩৮), 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯), 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪১), 'মধ্যবিত্ত' (১৯৪৩), 'কঞ্চি' (১৯৪৫) 'সিনেমার গল্প' (১৯৪৬), 'উজ্জ্বলা' (১৯৫৭), 'শৃণ্বন্তু' (১৯৬৩), 'আসন্ন' (১৯৭৩)। এছাড়া তাঁর লেখা একাঙ্ক নাটকের সংকলনগুলি হলো — 'দশভাণ ও আরো কয়েকটি' (১৯৬২), 'ত্রিনয়ন' (১৯৭৬), 'বাঁশি' (১৯৭৯), 'ঝুলন পূর্ণিমা', 'নমুনা', 'মাধব মুকুজ্যে', 'বর্ণমালা', অশ্রুর উৎস'।

২.

বনফুলের লেখা 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটি প্রথম প্রহসন হিসেবে প্রকাশিত হয় শনিবারের চিঠি পত্রিকায়। নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন দাদামশায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। নাটকটির প্রথম অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে সাতটি অঙ্কে বিন্যস্ত।

এই নাটকের প্রধান ভূমিকায় রয়েছে একটি কুকুর। নাটকটি শুরু হয় মোহনলাল ও চুমকির প্রেমালাপ দিয়ে। ক্রমশ নাটকের কাহিনি বৃত্তের মধ্যে যতই প্রবেশ করবো সেখানে দেখতে পাবো হারাধন ও শুভঙ্করীর দাম্পত্য জীবনের নিত্য কলহের চিত্ররূপ। আর সেই কলহের হাত ধরেই নাটকে কুকুরের আবির্ভাব। নাটকের প্রধান ভূমিকায় কুকুরের রূপায়ণ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম। হারাধন খুব ব্যাভিচারী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সেই কারণে তার স্ত্রী শুভঙ্করী তাকে কুকুর বানিয়ে রাখার হুমকি দেয়। অন্যদিকে ঝানু মল্লিকের থিয়েটারে বক্তিয়ারের পার্ট করানোর জন্য হারাধনকে অনুরোধ করে। হারাধন তার স্ত্রীর কেয়ারটেকার নিয়ে সমস্ত কিছু ঝানু মল্লিককে জানায় এবং স্ত্রীর ভয়ে সে পার্ট করতে রাজি হচ্ছে না। এদিকে স্বামীর সুমতি ফিরিয়ে আনার জন্য শুভঙ্করী বান্ধবী নয়নতারার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে। সে নয়নতারার কাছ থেকে জানতে পারে মঙ্গলহাটির গোপাল ঠাকুর গোপনে মদ ছাড়ানোর মাদুলি দেয়। নয়নতারার মাদুলি জোগান দেওয়ার আগেই হারাধনের বাড়িতে ঝানু মল্লিক সন্ন্যাসীর বেশ ধরে হাজির হন এবং শুভঙ্করীকে স্বামীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার পথ বলেন। তিনি শুভঙ্করীকে বলেন —

> "...তবে বিধি অনুযায়ী শুদ্ধান্তঃকরণে করতে হবে। প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করলেই তিনি (হারাধন) কুকুরে রূপান্তরিত হবেন। দ্বিতীয়টি পাঠ করলেই আবার মনুষ্যদেহ ফিরে পাবেন। অনিষ্ট কিছু হবে না।" ১

***Corresponding Author:** সুভাষ উপাধ্যায়

ঝানু মল্লিকের মধ্য দিয়ে মন্ত্র মুগ্ধ বিষয়টির স্বরূপ উদঘাটন করতে চাইলেন। তিনি মন্ত্রপাঠের বিধিনিষেধও শুভঙ্করীকে শিখিয়ে দিলেন। শুভঙ্করীকে মন্ত্রের মারপ্যাঁচ দিয়ে বোকা বানিয়ে হারাধনকে বাড়ি থেকে বের করে আনেন এবং তার পরিবর্তে একটি কুকুরকে হারাধনের শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর থেকেই এই কুকুরকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনি পরিণতির পথে এগিয়ে যায়।

৩.

বনফুলের লেখা 'রূপান্তর' নাটকটি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকটির প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি, চতুর্থ অঙ্কে দুটি এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য রয়েছে।

অভাবের বশবর্তী হয়ে আলিবাবাকে রাজ-সরকারের সুরক্ষিত বন থেকে কাঠ চুরি করতে যাওয়া এবং তাকে ধরার জন্য বন রক্ষকদের অন্বেষণমুখীতা দিয়ে নাটকের কাহিনির সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু কাহিনি রূপায়ণ প্রসঙ্গে বনফুল প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন —

> "আরব্য উপন্যাসের এই সুবিদিত গল্পটি অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত নাটক 'আলিবাবা' রচনা করিয়াছিলেন। আলিবাবা হাস্যরসপ্রধান গীতিনাট্য। সেই একই গল্পকে অবলম্বন করিয়া আমি নাটকটিতে ভিন্ন রস পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।" ২

নাটকের কাহিনির অভ্যন্তরে যত প্রবেশ করবো ততই রূপান্তরের আক্ষরিক ও গূঢ়ার্থটি বুঝতে পারবো। নাটকের পাত্রপাত্রীরা সবাই দারিদ্র্যতা থেকে সচ্ছল জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখে। আনোয়ার সর্দারকে সরিয়ে নিজে ডাকাত দলের রাশ ধরতে চায়। আবার আলিবাবা ডাকাতদলের গুচ্ছিত গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে স্ত্রী ফাতিমার কাছে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছে—

> "—এগুলো হীরে! তুই চিনিস্ না। সেখানে আরো আছে—অনেক আছে—প্রচুর আছে—হীরে আছে—সোনা আছে—মোহর আছে—রাশি রাশি আছে—একি এত চেঁচাচ্ছি কেন আমি! (আবার এদিক ওদিক চাহিয়া) শোন্ ফতিমা—ভাল করে শোন্—আলিবাবা আর গরীব কাঠুরে নেই—সে আমীর হয়ে গেছে—আমীর হয়ে গেছে—আমীর—আমীর—" ৩

আবার কাহিনির মধ্যে দেখা যায়, আনোয়ারের যুক্তি মেনে ডাকাতরা সর্দারকে তাদের ডাকাতি করা ধনসম্পদের ভাগ চায়। এখানেও রয়েছে নিজেদের সভ্য-মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার তাড়না। নাট্যকার আলোচ্য নাটকে মানুষের দু'দিকের রূপান্তরের বিষয়টি দেখিয়েছেন। একদিকে ধনসম্পদের সহায়তায় দারিদ্র্যতা থেকে সচ্ছল জীবনে পদার্পণ করা। অন্যদিকে, দস্যুবৃত্তি থেকে সভ্য মানুষে রূপান্তরিত হওয়া।

৪.

বনফুলের উল্লেখযোগ্য একটি নাটক হলো 'শ্রীমধুসূদন'। নাটকটি মোট একুশটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন সাহিত্য রসিকবন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ রায়কে। তিনি ভাগলপুরের ছাত্রীদের মধুসূদনের জীবনী সম্পর্কে পাঠদান করতে গিয়ে মধুসূদনকে নিয়ে উপন্যাস লেখার সংকল্প করেছিলেন। বন্ধু অমূল্যকৃষ্ণ রায়ের পরামর্শেই 'শ্রীমধুসূদন' নাটক লিখতে মনস্থির করেন। নাটকটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

> "এই নাটকের নায়ক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহা ইতিহাস অথবা জীবনচরিত নহে—নাটক।" ৪

তিনি এই প্রসঙ্গে অকপটে স্বীকার করেছেন যে, মধুসূদনের জীবনী পড়ে নাটক লেখার অভীপ্সা মনের মধ্যে এসে হাজির হয়। তবে এই নাটকের সিংহভাগ জুড়ে মানুষ মাইকেল গড়ে তোলার প্রয়াস বজায় রাখলেন। নাটকের নবম দৃশ্যে 'ইনিড' থেকে একটি ল্যাটিন ছত্র আবৃত্তি করেছেন। তার ইংরেজি অনুবাদটি এই নাটকে লিখেছেন—

> "Whoso thou art, not hated I think of the immortals dost thou draw the breathof life..." ৫

এই নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> "মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে বাংলায় বেশ কয়েকটি নাটক লিখিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে বনফুল রচিত 'শ্রীমধুসূদন' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।" ৬

আলোচ্য নাটকে মাইকেলের জীবন শৈলী সিংহভাগ জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। যার হাত ধরে দেখতে পাই মাইকেলের বিলাসবহুল ও রাজসিক বেহিসেবীপনার মূর্ত রূপ। সেই কারণে নাট্যকার মধুসূদনের মুখে সংলাপ বসাতে গিয়ে লিখেছেন—

> "They should let me gomy own way— তাঁরা আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন —প্রতিপালন করেছেন—ওখানেই তাদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে—এরপর আমার জীবনের ভার আমার হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত! আমার ambition অনেক বেশী। I want to go to England— I want to become a great poet—why should I rot in this barbarous Hindu Society of Bengal?" ৭

৫.

জীবনী সাহিত্যেকে কেন্দ্র করে লেখা বনফুলের উল্লেখযোগ্য নাটক 'বিদ্যাসাগর'। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪১। নাটকটির কাহিনি প্রথম অঙ্কে তিনটি, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি, চতুর্থ অঙ্কে দুটি, পঞ্চম অঙ্কে চারটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। নাটকটি উৎসর্গ করেছেন মেয়ে শ্রীমতী করবী মুখোপাধ্যায়কে।

এই নাটকটি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের কর্মবহুল জীবনের আলেখ্য। তাঁর কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করেই ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্তি রচনা করেছেন। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন—

> "নাটকীয় প্রয়োজনে আমি জ্ঞাতসারেই নিম্নলিখিত কার্যগুলি করিয়াছি—ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পারম্পর্য রক্ষা করি নাই, একাধিক স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছি এবং বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস সম্মত করিতে পারি নাই। আমি তাঁহাদের বংশধরদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

করিতেছি। ইঁহাদের সমন্ধে নির্ভরযোগ্য যতটুকু ইতিহাস আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা যতটা সম্ভব ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তত্ব-ব্যঞ্জক কোন ইতিহাস না পাওয়াতে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা যেন ক্ষুণ্ণ না হন, আমি যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারেই তাঁহাদের চিত্র অঙ্কিত করিলাম।" ৮

এই নাটকে বিদ্যাসাগরের জীবনে বন্ধু হিসেবে ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখের অবদান প্রস্ফুটিত হয়েছে। নাটকের কাহিনিতে দেখা যায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রমুখ অধ্যাপকগনের প্রসঙ্গ। আলোচ্য নাটকে বনফুলের দৃষ্টি বিদ্যাসাগর ও ইয়ংবেঙ্গল দলের থেকে একটুও সরেনি। সেই কারণেই নাট্যকার নাটকের কাহিনিগর্ভে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গল দলের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। এমনকি নাটকের প্রসঙ্গানুসারে ফোর্টউইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার মার্শালের কথাও নাট্যকার তুলে ধরেছেন।

৬.
মধ্যবিত্ত পরিবারের কথকতা নিয়ে রচনা করেছেন বনফুল 'মধ্যবিত্ত' নাটক। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩। নাটকটি তিনটি অঙ্কে বিন্যস্ত, কোনো দৃশ্য বিভাজন নেই। নাটকটি উৎসর্গ করেছেন করেছেন স্বনামধন্য কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে।
নাটকের প্রথমেই দেখতে পাই দুর্গামণি ও তার পিসামহাশয়ের কথপোকথন। এই কথোপকথনের কিছু অংশ বিচক্ষণতার সঙ্গে দেখলে দেখতে পাবো মধ্যবিত্ত পরিবারের কঠোর বাস্তব চিত্রকে।

"পিসামহাশয়: জ্যোতিষের সঙ্গে তাহলে গোত্রটোত্র সব মিল ছিল?
দুর্গামণি: তা ছিল, সে আকারে ইঙ্গিতে আভাসও দিয়েছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিলাম না।
পিসামহাশয়: কেন?
দুর্গামণি: ওর আছে কি, থাকবার মধ্যে আছে একখানা পুরোনো বাড়ি, তাও নাকি আবার বাঁধা আছে শুনলাম।
পিসামহাশয়: তা থাকলেই বা, ছেলেটি তো ভালো, বি.এ. পাশ করেছে, দেখতেও বেশ।
দুর্গামণি: ওসব নিয়ে কি হবে আমার? একটা চাকরি-বাকরি থাকতো না হয়—" ৯

৭.
'উজ্জ্বলা' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। নাটকটি ছয়টি দৃশ্যে বিভক্ত। নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন কল্যানীয়াসু শ্রীমতী কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই কেয়া দেবী ছিলেন তাঁর প্রথম সন্তান। এই নাটকের ভূমিকা অংশে লিখেছেন—

"আমার 'বন্ধন-মোচন' নাটকটি বহুদিন থেকে বাজারে নেই। সেটি পুনর্মুদ্রণ না করে তার মূল বক্তব্যটি এই গ্রন্থে বলবার চেষ্টা করছি।" ১০

আলেচ্য নাটকটি 'বন্ধন-মোচন' নামে বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ করেছিলেন।

সিদ্ধার্থ নন্দী নামে এক বড়লোকের মেয়ে উজ্জ্বলা। তিনি নারী সম্মান রক্ষা সমিতির খরচ চালান। এমনকি নন্দী মশায়ের অনুসঙ্গে খুঁজে পাই সুদখোর মহাজন জগনলালের পরিচয়। উজ্জ্বলা চরিত্র প্রসঙ্গে সুষমাকে বলতে শোনা যায়—

"বাষ্পে স্ফীত প্রকাণ্ড রঙীন বেলুনের মত ও সর্বদা উড়ে উড়ে বেড়াতে চায়, সবার চোখের সামনে অথচ সবার চোখের সামনে অথচ সবার নাগালের বাইরে। একটা দল পাকিয়ে নাটক করাটাই ওর স্বভাব। কোনও মহৎ প্রেরণার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেকে সবার সামনে আস্ফালন করাটাই ওর জীবন। ও আমাদের মত সাধারণ মেয়ে নয়, সত্যিই ও অসাধারণ।" ১১

এমনকি নারী সম্মান রক্ষা কমিটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উজ্জ্বলার অভিভাষণটিতে নারীর প্রতি সমাজের অবজ্ঞার সুরটি ধ্বনিত হয়।

"প্রিয় ভগিনীগণ, আপনাদেরই কথা আজ আবার আপনাদের শোনাতে এসেছি।... আজও কন্যার জন্ম হলেও শুভ শঙ্খধ্বনি হয় না, মায়ের চোখে জল আসে, বাবার মুখ শুকিয়ে যায়। কন্যাকে মনুষ্যত্ব-মর্য্যাদা দেবার চেষ্টা ক'জন করেন? যতদিন তার বিয়ে না হয় ততদিনে বাপের বাড়িতে সে পেট শিক্ষার বিরোধী যাঁরা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী, যাঁরা মনে করেন যে রাঁধুনী, চাকরানী, শয্যাসঙ্গিনী এবং জননী হওয়াটাই নারীত্বের বাঞ্ছনীয় পরিণতি, তাই তাঁরা যেন-তেন-প্রকারেণ কন্যাকে পাত্রস্থ করেই নিশ্চিত হতে চান।" ১২

উজ্জ্বলা জেল থেকে মনুষ্যত্বের যে ইস্তহার প্রকাশ করেছেন তা হল—

"বুদ্ধ, চৈতন্য, রবীন্দ্র, গান্ধীর উত্তরাধিকারী আমরা, শুভ্র মানবতাই হবে আমাদের আদর্শ। যে কোনও সৎকর্ম্ম হবে আমাদের ধর্ম্ম, যে কোনও সৎচিন্তাই হবে আমাদের প্রেরণা, সুস্থ সুন্দর, আনন্দময় জীবনের উদ্বোধন করব আমরা।... শক্তি হবে আমাদের মন্ত্র, সংযম হবে আমাদের সাধনা, সত্য হবে আমাদের আশ্রয়, আনন্দ হবে আমাদের লক্ষ্য।" ১৩

৮.
'কঞ্চি' নাটকটি ১৯৪৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকটির সূচনা স্থল একটি মফঃস্বলের একটি শহর। নাটকের অন্যতম চরিত্র ক্ষিতীশ। সে পেশায় প্রফেসর। এমনকি তিনি ধনীর সন্তান, সৌখিন জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং অবিবাহিত। বয়স তিরিশ। নাটকে অপর এক চরিত্র যতীন। তিনি পেশায় ডাক্তার সে ক্ষিতীশের সমবয়সী। এমনকি সেও ক্ষিতীশের মতো অবিবাহিত। নাটকের সূচনাতে দেখা যায় ক্ষীতীশের বিয়ে নিয়ে ক্ষিতীশ ও যতীনের পারস্পরিক কথোপকথন। আলোচ্য নাটকে ক্ষিতীশ তাঁর জন্য বাবার স্থির করা মেয়ের জাত প্রসঙ্গে বলেছেন—

"ক্ষিতীশ: সদ্বংশের হতে পারে; কিন্তু এক জাত নয় যে।
যতীন: কি রকম! তোমার বাবা অন্য জাতের মেয়ের সঙ্গে সমন্ধ করেছেন তোমার?
ক্ষিতীশ: আমি এম.এ., পি.এইচ.ডি মেয়েটি নিরক্ষর।" ১৪

নাটকে যতীন একজন পারিবারিক চাকর এবং সরকারী চাকুরীজীবীর তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"রামাকে একটা কড়া কথা বললে সে তৎক্ষণাৎ তার পাঁচ টাকার মাইনে চাকুরি ছেড়ে দিতে পারে—তোমার ওই প্রফেসরের মুখে লাথি মারলেও তিনি তা পারেন কিনা সন্দেহ।" ১৫

কাহিনি যত এগিয়ে গেছে ততই দেখতে পাই সুলতা ও ক্ষিতীশের প্রণয় কাহিনি এবং শেষমেশ তাঁদের শুভ পরিণয়ের বিষয়।

৯.
'সিনেমার গল্প'টি ১৯৪৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজিত ও শ্রীমোহন। নাটকের সূচনা স্থান শ্রীমোহনের সসুজ্জিত বৈঠকখানা। নাটকের উপক্রমণিকা থেকে জানতে পারি—

"... আমার বৈঠকখানায় একদা প্রভাতে বিখ্যাত একটি সিনেমা কোম্পানির বিখ্যাত প্রযোজক আসিয়া দর্শন দিলেন। নমস্কারান্তে যে বার্তাটি তিনি জ্ঞাপন করিলেন তাহা প্রকৃতই আনন্দজনক। আপনার 'দ্বৈরথ' বইটা আমরা নেব ভাবছি। বইটাতে অনেক পসিবিলিটি আছে"১৬

উপক্রমণিকায় আরো জানতে পারি, 'দ্বৈরথ' গল্পটা বিয়োগান্তক, কিন্তু সিনেমা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিলনের পক্ষপাতী। তাঁর মতে, দর্শকদের আনন্দ দেওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য। ম্যানেজিং ডিরেক্টর গল্পটাকে বিয়োগান্তক এর বদলে মিলনান্তক করতে চান। ডিরেক্টর নিজে নায়িকার পার্টে অভিনয় করলেন, কিন্তু তাঁর মতো করে পারটটা লিখে দিতে হবে। এমনকি ডিরেক্টর একটু বামপন্থী। মাস দুই পরে সিনেমার নাটকটির পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রযোজক মহাশয়ের একটি পত্র ছিল। তাঁর মর্মার্থ এই—

"অতিশয় দুঃখের সহিত সিনেমার গল্পের পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠাইতেছি। ছায়া জগতে যাহাকে রূপায়িত করিবার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই গল্পটি লিখাইয়াছিলেন সেই কুনকীই সরিয়াছে। সোহাগার ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে এমন অভিনেত্রীও বর্তমানে আমাদের নাই। আজকাল যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পেট অ্যাকট্রেস তিনি নৃত্যগীত পটীয়সী মাইফেলমোহিনী। বহ্নিকুমারীকে সোহাগা করিয়াছেন, সোহাগাকে যদি বাইজীতে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে হয়তো বইখানা আমরা প্রডিউস করিতে পারি।" ১৭

১০.
'শৃঙ্খল' নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। নাটকটি উৎসর্গ করেন মেজর খগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষকে। নাটকটির সূচনাস্থল চারিদিক স্বল্পালোকিত অন্ধকারে ঢাকা প্রান্তর। সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে পাঁচজন শিক্ষক বেরিয়ে এলেন। সকলের চেহারা জরাজীর্ণ, কঙ্কালসার, বেশবাসে দারিদ্র্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট, মুখে হতাশার ছাপ। অন্ধকারের বীভৎসতা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তৃতীয় শিক্ষক বলেছেন—

"নিজের অস্তিত্বের অর্থ হারিয়ে ফেলেছি যেন।আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানঅবিশ্বাস্য প্রহলিকার মতো মনে হচ্ছে।টলমল করেছে সব বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রতারণা করছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়।" ১৮

সেই বিষণ্ণতায় সন্ত্রস্ত হয়ে চতুর্থ শিক্ষক বলেছেন, ইহলোকের সুখ ও পরলোকের শান্তি যেন সবই নিঃশেষ হতে বসেছে। সবার বিষণ্ণতার উত্তরে পঞ্চম শিক্ষক বলেছেন—

"আমরাই মূর্তিমান অন্ধকার।আমাদের দীপ নিভে গেছে।আমাদের আলো আমরা বন্ধক রেখেছি, বিক্রি করেছি, বণিকের কাছে শয়তানের কাছে ধূর্তের কাছে।আলো তারা নিবিয়ে দিয়েছে।তারা শিখিয়েছে প্রদীপটাকেই আলো বলতে, শিখাহীন প্রদীপকেই আলো বলছি আমরা।" ১৯

নাটকের কাহিনিবৃত্তে এসেছে রাজনীতির নোংরা তোষননীতি।আবার সেই রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তৃতীয় শিক্ষক বলেছেন—

"ধর্মও এক নয়।নানা ধর্মের ছিটে মানব সমাজ সাজিয়েছে নিজেকে যুগে যুগে।আজ রাজনীতি নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে ধর্ম নিয়েও অনেক যুদ্ধ হয়েছে অতীতে।অনেক রক্ত প্লাবিত করেছে পৃথীবীকে ঝরেছে অনেক অশ্রু; আকাশের নীলকে আরও নীল করেছে আর্তের হাহাকার। সে সব কাহিনী দগদগে ঘায়ের মতো দগদগ করছে ইতিহাসের পাতায়।" ২০

দ্বিতীয় শিক্ষক এই রাজনীতিকে মুখোশ বলেছেন। সেই মুখোশের আড়ালে ছিল রাজনীতি, স্বার্থ-নীতি, পীড়ন-নীতি এবং অহংকারের আস্ফালন-নীতি। এই অধঃপতন থেকে উত্তরণের পথ বলে দিতে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। তাই মন্দিরের ভেতর হতে উদাত্ত কণ্ঠে শোনা যায়—

"বীর হ। সর্বদা বল 'অভীঃ অভীঃ'। সকলকে শোনা মাভৈঃ মাভৈঃ। ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নয়ক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার। 'আমি অমর চিন্ময় আত্মা' এই ভাব দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ কর।" ২১

সেই কারণে নাট্যকার উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন—

"...আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের একজন প্রগাঢ় ভক্ত। এসব ছাড়াও আপনি একজন নাট্যরসিক এবং সুঅভিনেতা। এই নাটকটিতে যুগের পটভূমিকার উপর স্বামীজির বাণীমূর্তিকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেছি।" ২২

১১.
'আসন্ন' নাটকটি ১৯৬৫ সালের বৈশাখ মাসে নব কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার পর যে সব দুর্নীতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে বিষাক্ত করেছে, উত্তেজিত করেছে, বিপথে চালিত করেছে, যে সব দুর্নীতি উন্মূলিত না হলে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন তারই সাহিত্যিক রূপ আভাসিত হয় আসন্ন নাটকে। নাটকটি যখন নবকল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন নাম ছিল রাগ ভৈরব। পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় নতুন

নামকরণ করেন আসন্ন। এই নাটকের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাট্যকার বলেছেন—

> "এই নাটকের চরিত্রগুলি কাল্পনিক। কিন্তু যে সব দুর্নীতির কথা এতে বলেছি তা অবশ্য কাল্পনিক নয়। সেগুলি সুবিদিত। কাগজে পড়েছি, লোকমুখে শুনেছি, নিজেও দেখেছি কিছু কিছু।" ২৩

১২.
বনফুলের 'দশভাণ ও আরো কয়েকটি' নাট্য সংকলনটি প্রকৃতপক্ষে বারোটি একাঙ্ক নাটকের সংগ্রহ। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। এই সংকলনটি তিনি উৎসর্গ করেন সুনিপুণ কথাশিল্পী শ্রীমনোজ বসুকে। এই সংকলনের উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটকগুলি হলো- শিক-কাবাব, লেহ্য, জল, অবাস্তব, নব সংস্করণ, বানপস্থ, কবয়ঃ, আকাশ নীল, অন্তরীক্ষে, ১৩ই শ্রাবণ,১৩৪৮, কবিতা বিভ্রাট, ক্লিওপেট্রা। বনফুলের অপর একটি একাঙ্ক নাটক সংকলন হল 'ত্রিনয়ন'। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। এই সংকলনটি উৎসর্গ করেন কল্যানীয়াসু শ্রীমান প্রভাসকুমার চক্রবর্তীকে। এই সংকলনের অন্তর্গত একাঙ্ক নাটকগুলি হল— ঠুংরি, চ-বৈ-তু-হি, কৈকেয়ী। বনফুলের শেষলেখা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একাঙ্ক নাটক বাঁশি। নাটকটির প্রকাশকাল ১৯৭৯।

১৩.
বনফুল কথাসাহিত্যের মতো নাট্যসাহিত্যের ধারায়ও বিষয় বৈচিত্র্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। নাটক রচনার প্রথম পর্বেই দেখা যায় কুকুরের মত ইতর প্রাণীকে কাহিনি অনুসারী চরিত্র হিসেবে হাজির করার দক্ষতা। তারপর তিনি আরব্য কাহিনি অনুসরণে মানবের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ রূপান্তর নিয়েও কাহিনি সৃজনের স্পর্ধা দেখিয়েছেন। তারপর বাঙালির সফল সন্তানদের জীবনীকে অবলম্বন করেও নাটক রচনা করেছেন। যেখানে মহান সন্তানদের জীবন শৈলীর আলো-অন্ধকার উভয় দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন। আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের আশা-নিরাশার বিষয়কে কেন্দ্র করেও তিনি 'মধ্যবিত্ত' নাটক রচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর নাটকে নারীমুক্তির প্রয়াস, স্বামীজির বাণীমূর্তি, কবির স্বপ্নে নারী জাগরণের বিষয়ও সুন্দর ও সাবলীলভাবে নাটকের কাহিনিবৃত্তে স্থান পেয়েছে। সবদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরিশেষে বলতে পারি বনফুল বাংলা সাহিত্যের একজন দক্ষ নাট্যকার।

তথ্যসূত্র:

1. বেরা অবনীন্দ্রনাথ (প্রকাশক), বনফুলের নাটক সমগ্র, ১ম খন্ড, বাণী শিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৬
2. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৬৫
3. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১৯
4. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৬৬
5. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৬৭
6. ৬.ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৬৭
7. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৫
8. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৬৯
9. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫৯
10. বেরা অবনীন্দ্রনাথ (প্রকাশক), বনফুলের নাটক সমগ্র, ২য় খন্ড, বাণী শিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২৫
11. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩
12. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩
13. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৬
14. বেরা অবনীন্দ্রনাথ (প্রকাশক), বনফুলের নাটক সমগ্র, ১ম খন্ড, বাণী শিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৯৭
15. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৯৮
16. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৩১
17. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৬১
18. বেরা অবনীন্দ্রনাথ (প্রকাশক), বনফুলের নাটক সমগ্র, ২য় খন্ড, বাণী শিল্প, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৬৩
19. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৬৪
20. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৭০
21. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭৫
22. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২৬
23. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২৭